কবিগুরুর স্নেহধন্যা 'টমবয়' —মালতী চৌধুরী

মিনতি দত্ত

আজ যার সম্বন্ধে বলতে চাইছি, সেই মালতী দেবীর পরিচয় পর্বটি সেরে নিই। বিহারের বিখ্যাত আইনজীবী, জাতীয়তাবাদী গুরুরপ্রসাদ সেনের জ্যেষ্ঠপুত্র কুমুদনাথ সেনের সঙ্গে 'ইলবাট বিল' আন্দালনের সঙ্গে যুক্ত—বিহারীলাল গুপ্তর কন্যা স্নেহলতার বিয়ে হয়। যাদের বিয়ে সাক্ষী ছিলেন প্রখ্যাত দুই ব্যক্তি— আনন্দমোহন বসু ও রমেশচন্দ্র দত্ত। এই কুমুদ ও স্নেহলতারই কনিষ্ঠ কন্যা মালতী দেবী। মালতীর জন্ম ১৯০৪ সালের ২৬ জুলাই। মালতীকে নিয়ে ওরা ছ'ভাই বোন।

মালতীর বড় দাদা প্রদ্যোৎকুমার সেন ও ছোট কুলপ্রসাদ সেন। তার আরও দুই দাদা ও বড় এক দিদি ছিলেন। স্নেহলতা অর্থাৎ মালতীর মায়ের লরেটো স্কুলে সহপাঠিনী ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর কন্যা ইন্দিরা। এই বন্ধুত্বের সূত্রেই স্নেহলতার ঠাকুর বাড়ির সাথে পরিচয়। স্নেহলতার বাবা বিহারীলাল গুপ্তকে রবীন্দ্রনাথ বিহারীদা বলে ডাকতেন এবং গল্পগুচ্ছের প্রথম খণ্ড বিহারীলালকে উৎসর্গ করেছিলেন।

কুমুদনাথ কলকাতা হাইকোর্টের এক উদীয়মান ব্যারিস্টার ছিলেন। অল্পবয়সে (চল্লিশোর্ধ) তাঁর মৃত্যু হলে মালতীর মা স্নেহলতা তাঁর ৬ ছেলেমেয়ের পড়াশুনার দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নেন। পিতার মৃত্যুর সময় মালতীর বয়স মাত্র তিন। মালতীর দাদু বিহারীলালের পরামর্শেই মেয়ে স্নেহলতা তাঁর দুই ছেলে প্রদ্যোৎ ও সুহৃৎকে শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মবিদ্যালয়ে ভর্তি করান। মা স্নেহলতা পাটনা গার্লস স্কুলে ভর্তি করেছেন। এখানেই মালতীর সাথে পরিচয় হয়, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দুই কন্যা মঞ্জুশ্রী ও জয়শ্রীর সঙ্গে।

সময়টা হচ্ছে স্বদেশি আন্দোলনের যুগ। গান্ধীজি ডাক দিয়েছেন অসহযোগ আন্দোলনের, অনেক ছেলেমেয়ে স্কুল কলেজ ছেড়ে আন্দোলনে নেমেছেন। মালতীর ছোট দাদা কলেজে ছেড়ে শান্তিনিকেতনে চলে যান এবং স্কুলে গান্ধীজির নির্দেশ অনুযায়ী কাজকর্ম শুরু করেন। ততদিনে বড়ছেলে প্রদ্যোৎ পাশ করে চাকরি শুরু করে মায়ের পাশে দাঁড়িয়েছে। এই সময়টুকু রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে স্নেহলতা অর্থাৎ মালতীর মা অবৈতনিকভাবে শান্তিনিকেতনে ছাত্রীনিবাস স্থাপন করার ভার নিয়ে, কলকাতা ছেড়ে চলে যান। রবীন্দ্রনাথ স্নেহলতাকে লেখেন, 'আমি মেয়েদের জন্যে ছাত্রীনিবাস শুরু করতে চাই, তুমি এসে দায়িত্ব নাও।' স্নেহলতা তাঁর ছোট মেয়ে মালতীকেও নিয়ে যান। সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর দুই মেয়ে মঞ্জুশ্রী ও জয়শ্রীকেও ছাত্রীনিবাসে পাঠান।

মালতী বেথুন কলেজিয়েট স্কুলে পড়ার সময়ই গান্ধীজির ডাকে পালিয়ে যান রংপুরে কাকার বাড়িতে। তারপর মায়ের টেলিগ্রাম পেয়ে ফিরে আসেন। বেথুন থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ভালভাবে পাশ করে, বেথুন কলেজেই বটানি নিয়ে পড়তে শুরু করেন। পরে বিশ্বভারতীতে ইংরেজি পড়তেন অ্যান্ড্রুজের কাছে আর বাংলা পড়ানেত ক্ষিতিমোহন সেন। মালতীর গানের গলা ছিল চমৎকার। ভাল অভিনয় করতেন, ভাল বাঁশি বাজাতেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ মালতীকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। রবীন্দ্রনাথের আদরের নাতনি সুরেশের মেয়ে মঞ্জুর সঙ্গে মালতীর খুবই নিবিড় বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল। তাই কবি মধুমালতীর ফুলে ফুলে ভরা একটি লতার নাম দিয়েছিলেন 'মঞ্জুমালতী'। মঞ্জুশ্রীও খুব সুন্দর গান গাইত। আর মালতীর দুষ্টুমির জন্য ওকে সবাই এমনকি গুরুদেব পর্যন্ত ওকে 'টমবয়' নামে ডাকতেন। মালতী খুব ভাল তির ছুঁড়তে পারতেন। তাঁর তিরে কাঠের ডুমো লাগানো থাকতো। রবিঠাকুরের সমস্ত গানের ভান্ডারী ছিলেন দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সবাই বলতেন দীনদা। একদিন গান শিখিয়ে তিনি মাঠ দিয়ে যাচ্ছিলেন, মালতী তার গোড়ালি লক্ষ্য করে তির ছোঁড়েন, দীনদা বলে ওঠেন। গেলুমরে। মালতী হেসে বলে, তোমাকে গুরু প্রণাম করছি দীনদা। গুরুদেব একটি গান লিখে সুর দিয়েছেন এবং গানটি কয়েকবার গেয়েছেন। মালতী ঠিক সুরটি ধরে ফেলে ঘুরে ঘুরে গান গেয়ে যাচ্ছে, কবি অবাক! সুরটি চেনা কিন্তু কথাগুলো বুঝতে পারছেন না। মালতী একটা লাইনই ঘুরে ফিরে গেয়ে চলেছেন — ণেরগজা যায় রীবভবি রিমরিম... রবীন্দ্রনাথ বুঝলেন গানটি উল্টো গাইছে মালতী। 'জাগরণে যার বিভাবরী মরি মরি'। আর একদিন পিয়ারসন সাহেবের বাড়িতে একজন বন্ধুকে নিয়ে গিয়ে বললেন সাহেব কোথায়? উনি আজ আমাদের নিমন্ত্রণ করেছেন। কাজের লোকটি আমতা আমতা করে বললেন, উনি তো নেই। তারপর বাড়িতে যা খাবার ছিল, তাদের পেট ভরে খাইয়ে দিলেন। আবার এই মালতীই খুব গান্ধীভক্ত ছিলেন, এবং অসহযোগ আন্দোলনের সময় গান্ধীজি গ্রেপ্তার হলেন তিনি পুরো একদিন অনশন করেন।

এই সময় উড়িষ্যার প্রসিদ্ধ দেশপ্রেমিক চৌধুরী পরিবারের ছেলে নবকৃষ্ণ চৌধুরী শান্তিনিকেতনে পড়তে আসেন। দাদা গোপকৃষ্ণ চৌধুরী উড়িষ্যার প্রসিদ্ধ জাতীয়তাবাদী নেতা ছিলেন। তার স্ত্রী রামদেবীও স্বাধীনতা আনোলনে সমাজসংস্কার আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন। মালতীর দাদা কুলদাপ্রসাদ সেনের সাথে স্কুলে পড়ার সময় নবকৃষ্ণের খুবই বন্ধুত্ব হয়। এই সূত্রেই মালতীর সাথে তাঁর পরিচয়। পরিচয়ের এক মাসের মধ্যে কলকাতায় নবকৃষ্ণ চৌধুরী ও মালীত সেনের বিয়ে হয়। মালতী সেন থেকে মালতী চৌধুরী হন। কিন্তু নবকৃষ্ণের মা বাঙালি এক ব্রাহ্ম মেয়েকে তাঁর পুত্রবধূ হিসাবে মেনে নিলেন না, গ্রহণ করলেন না। কিন্তু নবকৃষ্ণের দাদা গোপবন্ধু ও তাঁর স্ত্রী

রামদেবী মালতীর পাশে এসে দাঁড়ান। সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশ, ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন খাওয়াদাওয়া তার চেয়েও বড় কথা তাঁকে পরিবারে গ্রহণ করা হচ্ছে না, এ অবস্থায়ও অসাধারণ ক্ষমতায় মালতী নিজেকে পরিবারের সঙ্গে একাত্ম করে ফেলতে পারলেন এবং পুত্রবধূর মর্যাদা ও ভালবাসা পেলেন।

রমা চৌধুরী, গোপবন্ধু চৌধুরী, মালতী দেবী, নবকৃষ্ণ চৌধুরী, গোপবন্ধু দাস, ঠক্কর বাপা —এমন অনেকে মিলে গুজরাত আন্দোলন শুরু করেন এবং সগঠিত করেন এক নব জাগরণ আন্দোলন। ১৯৩০ -এ গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ আন্দোলন। ডান্ডি অভিযানে সবরমতী আশ্রম থেকে দীর্ঘ পথ হেঁটে লবন আইন ভঙ্গ করা হয়। তাতেও সামিল ছিলেন মালতী ও নবকৃষ্ণ। আইনভঙ্গ অপরাথে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। গান্ধী-আরউইন চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পর অন্যান্য বন্ধীদের সাথে ওরাও মুক্তি পেলেন। ১৯২৮-র কলকাতা কংগ্রেসে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অধিনায়ক সুভাষচন্দ্র বসুর কার্যক্রম এবং লতিকা ঘোষের নেতৃত্বে মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনি—মালতী ও রমাদেবীকে প্রভাবান্বিত করে। মালতীদেবী সাইকেল করে গ্রামের পর গ্রাম ঘুরে বেড়াতেন কংগ্রেসের জন্য চাঁদা লোলার জন্য। অভ্যাসটা অবশ্যই হয়েছিল শান্তিনিকেতনে। সাইকেল ঘুরে ১৯৩৫-৩৬ সালে মালতী উড়িষ্যার কৃষকদের আন্দোলন সংগঠিত করেন। গরিব চাষীদের বলতেন জমিদারদের অত্যাচারের কথা। মাঝে মাঝে গান গেয়েও বোজাতেন শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনতেন। এভাবেই উৎকল কৃষক সঙ্ঘ তৈরি। মালতীদেবী একমাত্র মহিলা যিনি সাহস করে স্বেচ্ছাসেবীদের ড্রিল করাতেন। মালীত ও রমাদেবী তৈরি করলেন এক মহিলা বাহিনি।

উড়িষ্যাতেও কংগ্রেস ক্ষমতায় এলো। নবকৃষ্ণ চৌধুরী তিরতল থেকে আইনসভায় নির্বাচিত হলেন। ১৯৩৭-এ মালতী দেবীর নেতৃত্বে এক বিশাল কৃষক সমাবেশ হলো কটকে। মুখ্যমন্ত্রী বিশ্বনাথ দাস ওই সভায় প্রতিশ্রুতি দিলেন বিহার ও উড়িষ্যায় অন্যায় প্রজাস্বত্ব আইনটি তুলে দেবেন। জয়প্রকাশ নারায়ণের সঙ্গে আলোচনা করে নবকৃষ্ণ চৌধুরী প্রতিষ্ঠা করেন Congress workers Communist League। মালতী চৌধুরী এই সংগঠনের জন্য তাঁর সমস্ত অলংকার দিয়ে দেন। যার অর্থমূল্য ঐ সময় ৫০ লক্ষ টাকা। এই অর্থে দলের সাপ্তাহিক মুখপত্র সারথি প্রকাশিত হয়। জাতীয় আন্দোলনের তীব্রতার সঙ্গে সঙ্গে অত্যাচারী দেশীয় রাজ্যগুলিতে প্রজাবিদ্রোহ দেখা দেয়। উনিষ্যার অধিকাংশ রাজ্যই আদাবাসী ও উপজাতি অধ্যুষিত ছিল। রাজার পুলিশ, কর্মচারী ও জমিদাররা এই সমস্ত গরিব নিচুতলার মানুষের উপর অত্যাচার করত। বেআইনী করা আদায়। জুলুম জবরদস্তির শেষ ছিল না। যদি কোনো আদিবাসীকে বাঘ আক্রমণ করতো সে আত্মরক্ষার জন্য যদি বাঘকে মারর, তাকে দিতে হতো বাঘ কর (Tiger Tax)। এদের অত্যাচারে শত শত প্রজামন্ডলের কর্মীরা ওখান থেকে পালিয়ে ব্রিটিশ শাসিত অনুগুলো এসে আশ্রয় নেয়। এরা প্রায় সবাই আদিবাসী। সময়টা ১৯৩৮-৩৯। এখানে তখন কংগ্রেস সরকার। মালীত ও তার রাজনৈতিক সহকর্মীরা মিলে তৈরি করেন রিলিফ ক্যাম্প। এখানে কাজ করবার সময়ই তাঁর মনে হয়, এখানে একটা আশ্রম করা গেলে ভালো হয়।

একবার অনুগুল থেকে ২৫ কিমি দূরে কামসোলাতে প্রজামণ্ডলের এক সভা হচ্ছিল। এলাকাটি ব্রিটিশ শাসিত এলাকা সুতরাং দেশীয় পুলিশের এখানে ক্ষমতা ছিল না। ঐ সময় তালচের থেকে ১০০০ কৃষক সমাবেশে যোগ দিতে আসছিল। একজন মদ্যপ পুলিশ ন্সিপেক্টর মালতী দেবীকে বিশ্রী ভাষায় গালাগাল দেওয়ায় মালতী দেবী থানায় অভিযোগ করেন। থানার কর্তৃপক্ষ অক্ষমতা জানালে মালতীদেবী সোজা ইন্সপেক্টরকে পায়ের চবি খুলে মেরে তাড়িয়ে দেন। এমন সাহসী, প্রতিবাদ, দৃঢ়চেতা মহিলা ছিলেন মালতী।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাঁধলে। ইংরেজদের অত্যাচার শোষণ হলো মাত্রাহীন। গান্ধীজি এই সময় ১৯৪২ -এ ডাক দিলেন ভারত ছাড়ো আন্দোলন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে — মন্ত্র দিলেন 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে'। দেশবাসী ঝাঁপিয়ে পড়ল স্বাধীনতার সেই যুদ্ধে। মালতী চৌধুরী ও নবকৃষ্ণ চৌধুরী এই ভারতছাড়ো আন্দোলনে যোগ দিয়ে গ্রেপ্তার হলেন। মালতীর বড় মেয়ে ১৪ বছরের উত্তরাও গোপনে বিপ্লবীদের চিঠি চালাচালি করার অপরাধে গ্রেপ্তার হয় এই সময়।' ১৯৪৫ -এ সবাই ছাড়া পেলেন।

নোয়াখলির সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় গান্ধীজির সাথী হয়ে তিনিও গেলেন নোয়াখালি। ভারবর্ষে তখন উত্তাল অবস্থা। রাজনৈতিক বন্ধীরা মুক্ত পাচ্ছেন, আবার প্রজামন্ডলের বিদ্রোহী কর্মীরা তখনও জেলে বন্দী। এই সময় মালতী টক্কর বাপ্পা তার দীর্ঘদিনের সহকর্মীর পরামর্শে যেসব কৃষকনেতা ও কর্মীরা বন্দী তাদের পরিবারের পাশে দাঁড়ান বা আশ্রয় দেবার জন্য মালতী চৌধুরী অনুগুলো ১০ একর জঙ্গল জমি কিনলেন এক জমিদারের কাছ থেকে। সেখানে কিছু বেড়া ঘর, ১০/১২ টি ছাত্র নিয়ে স্কুল খুললেন। ছাত্রদের থাকবার ব্যবস্থা করলেন এবং অসহায় স্ত্রীলোকদের সহায়তা করলেন।

এদিকে নবকৃষ্ণ ও মালতী চৌধুরী ঢেনকানলের অত্যাচারীর রাজার বিরুদ্ধে প্রজা বিদ্রোহ সংগঠিত করেন। রাজার সেনারা এদের আক্রমণ করে নবকৃষ্ণের পেটে ছুরিকাঘাত করে, তাকে বিদ্রোহীরা তাড়াতাড়ি নিয়ে গিয়ে নদী পার করে দেন, সেখানে রাজার কিছু করার ছিল না। মালতী এপথ সেপথ ঘুরে নদীর পাড়ে পৌঁছান। রাজার ভাড়া করা গুন্ডারা মালতীকে তাড়া করেন। এদিকে রাজার ভয়ে কোনো মাঝি মালতীকে নৌকা পার করতে চান না। তখন ১২/১৩ বছরের এক ছেলেমানুষ মাঝি মালতীকে পার করে দেন। কিন্তু পরে সে রাজার কোনো লোককে পার করতে রাজি হয় না। তখন তারা ঐ ছেলেটি, বাজি রাউতের উপর ভয়াবহ অত্যাচার করে তাকে হত্যা করে।

পরে উড়িষ্যার অনুগুলে মালতী যে জমি কিনে স্কুল ও ছাত্রাবাস করেন তার নাম রাখেন বাজি রাউত ছাত্রাবাস। আজ নবকৃষ্ণ চৌধুরী, মালতী চৌধুরী বেঁচে নেই। কিন্তু এদের আদর্শ নিয়ে বেঁচে আছে 'বাজি রাউত ছাত্রাবাস'। মালতী চৌধুরী এই ছাত্রাবাসে হরিজন ও আদিবাসী ছাত্রদের থাকা ও পড়াশুনার ব্যবস্থা করেন। বিশেষ করে স্বাধীনতার লড়াইয়ে যারা মারা গেছেন তাদের স্ত্রী ও বাচ্চাদের জায়গা হলো এখানে।

১৯৪৮-এ তৈরি হল 'উৎকলমজীবন মন্ডল'। বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষেকে নিয়ে গ্রাম এবং তাদের মানুষেদের নিয়ে মানুষের মতো বাঁচার অধিকার আছে। সে সম্বন্ধে তাদের সচেতন করা শিক্ষা দেওয়া শুরু হলো। যেসব মেয়েদের কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই, যারা বিধবা বা যাদের বিয়ে হয়নি এরকম মেয়েদের শিক্ষা দিয়ে সমাজকর্মীতে পরিণত করা হলো। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, দক্ষতা অর্জন, নেতৃত্ব এসবই তাদের শেখানো হতো শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে। তিনি যে ছাত্রাবাস তৈরি করেছিলেন সেটা নিছকই একটা থাকার জায়গা নয়। একটা অসম্ভব শৃঙ্খলার মধ্যে ছাত্রদের জীবন বাঁধা ছিল। তবে শৃঙ্খলিত নয়। ভোর সাড়ে চারটায় ঘুম থেকে উঠে প্রার্থনা, তারপর বাড়ির কাজ, স্কুলে পড়া, জায়গাটা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, বাগান করা, তাঁত বোনা, কাঠের জিনিস তৈরি করা, সেলাই করা, পড়াশুনার সাথে সাথে স্বনির্ভর করে তোলা। এদের প্রায় অর্থেক মেয়ে। মালতী দেবী দেখলেন ছেলেরা ও মেয়েরা প্রাইমারি স্কুল পাশ করে আর লেখাপড়ার সুযোগ পায় না। ১৯৫৪ সালে তিনি অনুগুল থেকে ১৫ কিনি দূরে চম্পাহাটি মুন্ডাতে স্কুল খুললেন, এখানে পড়ানোর সাথে সাথে শেখানো হতো মৌমাছি পালন, বাগান তৈরি করা। স্কুলটিতে সরকারি সাহায্যে ৮ম, ৯ম, ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ানো হত।

নবকৃষ্ণ চৌধুরী যখন মুখ্যমন্ত্রী (১৯৫১ - ৫৬) তখন একাধিকবার বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে মালতী চৌধুরী মিছিলে নেতৃত্ব দিয়েছেন। একবার তিনি বহু আদিবাসী পুরুষ ও মহিলাদের নিয়ে মিছিল করে গিয়েছিলেন মদ্যপান বন্ধ করার দাবিতে। নবকৃষ্ণের মুখ্যমন্ত্রিত্বের আমলেই ছাত্র মিছিলের উপর পুলিশ গুলি চালায়, একটি ছাত্রের মৃত্যু হয়। মালতী চৌধুরী ও তার সহকর্মীরা এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেন। ১৯৫৩ সালে মুখ্যমন্ত্রী পদে ইস্তফা দিয়ে অনুগুলে চলে আসেন নবকৃষ্ণ চৌধুরী। ক্ষমতার রাজনীতিকে নবকৃষ্ণ বা মালতী কেউই পছন্দ করেননি— তাই অনায়াসে তাঁরা ক্ষমতার থেকে সরে আসতে পেরেছেন। ১৯৬০'র দশকে যখন নকশাল আন্দোলন সবে মাথা তুলতে শুরু করেছে, তখন নবকৃষ্ণ ও মালতী তৈরি করেন Civil Liberties Organisation। ভারতবর্ষে ওরাই প্রথম এই সংগঠন তৈরি করেন —যাতে বেআইনিভাবে আটক রাজনৈতিক বন্দিদের আইনি সাহায্য দিতে পারেন। নকশাল আন্দোলনে যুক্ত রাজনৈতিক কর্মীদের হিংসার রাজনীতি থেকে সরে আসার জন্যে বুঝিয়েছেন। হিংসা হিংসাকে বাড়ায়। কিছু কর্মী ওদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ওদের আশ্রমে যোগ দেন। নকশাল নেতা ও কর্মীদের সাথে যোগাযোগের কারণে ইন্দিরা গান্ধী যখন দেশে জরুরি অবস্থা জারি করেন উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী নন্দিনী শতপথী এদের গ্রেপ্তার করেন। জেলে অত্যাচারও খুব হয় এদের উপর।

উড়িষ্যায় যখন ন্যাশনাল অ্যালুমিনিয়াম কারখানা হলো (NALCO) মালতীদেবী তার প্রতিবাদ করেন। এই পাঁচটা গ্রামে ছেলেমেয়েরা তালাচাবি, ডোকরার কাজ করে জীবন চালাত এরা বানজারা গোষ্ঠী, লোধা, শবর লোভে পড়ে ওরা ফ্যাক্টারীতে যায়, পরে এই পাঁচটা গ্রামই পতিতাপল্লী হয়ে যায়। রাউরকেল্লায় যখন আদিবাসীর দাঙ্গা বাঁধলো সেখানেও মালতীদেবী হাজির হলেন। আদিবাসীদের বোঝালেন মুসলমানরা তাদের শত্রু নয়। তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করলেন দাঙ্গা থামাতে। ক্ষমতার হাতছানি তিনি অনায়াসেই দূরে সরিয়ে দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন তাঁকে তৈরি করেছে। একটা অন্য দর্শন ও একটা সুস্থ সুন্দর সংস্কৃতির মধ্যে তিনি বড় হয়েছেন। গান্ধীজির কর্মযোগ, বিশেষ করে মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ মালতীকে মানুষের মধ্যে এনে দাঁড় করিয়েছে। আর সে মানুষরা শিক্ষিত, সচেতন মানুষ নয়। বিবেকানন্দের অশিক্ষিত, হতদরিদ্র অসংস্কৃত সমাজের সবচেয়ে নিচের তলার ছেলেমেয়েদের নিয়ে তাঁর বিরাট সংসার হয়েছে। তিনি সবার মা। মালতী চৌধুরী উড়িষ্যার 'নুমা' মা। নবকৃষ্ণ চৌধুরীর ১৯৮৫-তে মৃত্যু হলো তার নিজের হাতে তৈরি আশ্রমের গ্রন্থাগারে। একরাশ বইয়ের মধ্যে নিঃশব্দে ঘুমিয়ে পড়লেন। একলা মালতী দীর্ঘদিনের সঙ্গীকে হারিয়ে ভেঙে পড়লেন। কিন্তু আশ্রম ছাড়লেন না। মালতী চৌধুরী সমস্ত জীবনটাই দেশের জন্য ও অবহেলিত আদিবাসী ও বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষের জন্য উৎসর্গীকৃত। ওদের মাথা উঁচু করে বড়ো হয়ে ওঠাটাই তাঁর সবচেয়ে বড়ো প্রাপ্তি। গুরুদেবের স্বপ্ন যে মালতীরও স্বপ্ন ছিল।

সঠিক তথ্য সহায়তার জন্য মঞ্জু চট্টোপাধ্যায়ের কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।